**বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬**
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.006

# *ডাইম নিকেল* উপন্যাসের প্রকরণ-কৌশল

শারমিন মুস্তারী*

**সারসংক্ষেপ**

রিজিয়া রহমান বাংলাদেশের সাহিত্যের শক্তিমান কথাকার। তাঁর উপন্যাসে রয়েছে বিচিত্রগামী আখ্যান। *ডাইম নিকেল* (২০০৬) তাঁর স্বল্পপরিসর একটি উপন্যাস। উপন্যাসে শীলা ও হাসান দম্পতির কাহিনির মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী তৃতীয় বিশ্বের অভিবাসী সমাজ ও তাদের সাংস্কৃতিক সংকটকে তুলে ধরা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর তৃতীয় বিশ্ব থেকে অজস্র শ্রমজীবী মানুষ কাজের সন্ধানে পাড়ি জমায়। গড়ে তোলে তাদের সমাজ। স্বল্প মজুরির কাজ পেতে ছুটে চলে দিনরাত। শেকড় থেকে দূরে বসবাসকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠা অভিবাসী সমাজ, তাদের অভিজ্ঞতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যান্ত্রিক জীবন, নতুন পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া, নস্টালজিয়া এবং তাদের সাংস্কৃতিক সংকটের যে আখ্যান ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন, তার নির্মাণশৈলী অন্বেষণই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

**চাবি শব্দ :** রিজিয়া রহমান, ডাইম নিকেল, অভিবাসী, সাংস্কৃতিক সংকট এবং ভাষা।

রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রতিনিধিত্বশীল কথাকারদের অন্যতম। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। কবিতা দিয়ে তাঁর লেখালেখি শুরু হলেও বাংলাসাহিত্যে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ঔপন্যাসিক হিসেবে। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ৩৭। প্রথম উপন্যাস *ঘর ভাঙা ঘর*-এর বিষয় নদীর ধারে বাসা বাঁধা শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের জীবনপ্রবাহ, যাদের নির্দিষ্ট কোনো বৃত্তি নেই। এরপর রিজিয়া রহমান একে একে রচনা করেন *উত্তর পুরুষ*, *রক্তের অক্ষর*, *বং থেকে বাংলা*, *অলিখিত উপাখ্যান*, *শিলায় শিলায় আগুন*, *সূর্য সবুজ রক্ত*, *একাল চিরকাল* প্রভৃতির মতো বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর গল্পগ্রন্থ চারটি: *অগ্নিস্বাক্ষরা* (১৯৬৭), *দূরে কোথাও* (২০০৪), *খাওয়া-খায়ির বাঙ্গালি* (২০১০) ও *চার দশকের গল্প*। রিজিয়া রহমানের আত্মজৈবনিক রচনাগুলো হলো : *নদী নিরবধি* (২০১২), *প্রাচীন নগরীতে যাত্রা* (২০১২) ও *দুঃসময়ের স্বপ্নসিঁড়ি* (২০২০)। তাঁর শিশুতোষ রচনার সংখ্যা তিন। সেগুলো হলো: *আজব ঘড়ির দেশে*, *ঝিলিমিলি তারা* ও *মতিশীলের বাড়ি ও অন্যান্য*। তাঁর অনুবাদগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : *Caged in Paradise and Other Stories* (২০১৩) ও *সোনালী গরাদ* (১৯৯৫)। প্রত্যেকটি গল্প বা উপন্যাসে বিষয় নির্বাচনে রিজিয়া রহমান সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দেখার চোখটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পর্যবেক্ষণক্ষমতা গভীর। তিনি প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম এবং আধুনিক থেকে আধুনিকতম জীবন ও জনপদে বিচরণ করেছেন।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

রিজিয়া রহমান কথাসাহিত্যে জীবনের বিচিত্র দিকের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ষাটের দশকে বাংলাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। কবিতা দিয়ে লেখালেখি শুরু হলেও তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ঔপন্যাসিক হিসেবে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসের জগতে তাঁর একটি সুপরিণত জায়গা রয়েছে। অভিজ্ঞতায় ও বিশ্বাসযোগ্যতায় উজ্জ্বল তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে রয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী ও বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রকাশ। তিনি নানা উপাদান ও উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডার।

রিজিয়া রহমানের লেখার পাঠ, আলোচনা-সমালোচনা, গবেষণা অনেকটা ছায়াবৃত্ত। এর মধ্যে তাঁর লেখকমানস নিয়ে কারো কারো অভিমত প্রণিধানযোগ্য। ইতিহাস সন্ধানী ও সমকালদর্শী লেখক রিজিয়া রহমানের বহুল আলোচিত উপন্যাস *বং থেকে বাংলা* সম্পর্কে গবেষক বিশ্বজিৎ ঘোষের উক্তি :

> শ্রম-অধ্যবসায়-ইতিহাসজ্ঞান এবং শিক্ষা-চেতনার আন্তরমিলনে *বং থেকে বাংলা* উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। এখানে ইতিহাসকে তিনি স্বচ্ছন্দ-প্রয়াসে পরিণত করেছেন শিল্পে এবং শিল্পের দাবিতেই, সঙ্গত কারণে, ইতিহাসের ধূসরতায় মিশেছে কল্পনার সৌরভ।[১]

রিজিয়া রহমানের উপন্যাস নিয়ে ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হকের উক্তি স্মরণ করা যায় :

> রিজিয়া রহমানের পড়াশোনার পরিধি অনেকের চেয়ে বেশি, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা না হলে *বং থেকে বাংলা* বা *রক্তের অক্ষর*-এর মতো উপন্যাস লেখা সম্ভব হতো না। সমাজের যে সমস্ত জায়গাগুলো অন্ধকার হয়ে আছে, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে, দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আছে, যেখানে অন্য কোন লেখক পৌঁছাতে পারেননি, সেসব জায়গাগুলোতে রিজিয়া রহমান কীভাবে আলো ফেলেছেন, সেটা আমার কাছে আশ্চর্যই লাগে।[২]

সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন রিজিয়া রহমানের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :

> রিজিয়া রহমানের অর্থনীতি জ্ঞান ছিল গভীর ও দীপ্র। ফলে সমাজকাঠামো, মানববিজ্ঞান, শোষণের প্রকৃতি, আধিপত্য বিস্তারের কলকাঠি তাঁর জানা ছিল। ইতিহাস-অবলম্বী উপন্যাস লেখার আগে তিনি গ্রন্থপাঠ শুধু নয়, রীতিমতো গবেষণায় লিপ্ত হতেন।[৩]

গবেষক নূর কামরুন নাহার রিজিয়া রহমান সম্পর্কে বলেন :

> মূলত রিজিয়া রহমান জীবনের কথাকার। জীবনের গল্পই তিনি বলে গেছেন কখনও ইতিহাসের মাটি খুঁড়ে, কখনও প্রান্তিক মানুষের অন্তর্লীন বেদনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কখনও নিপীড়িত মানুষের জেগে ওঠার গল্পের মধ্য দিয়ে। রক্তের অক্ষর উপন্যাসের নায়িকা ইয়াসমিনের রক্তমোছা ছুরির উল্টোপিঠে লেখা ছিলো রুশোর সেই বিখ্যাত উক্তি- Man is born free and everywhere he is in chains. মানুষের এই বন্দীত্ব, অসহায়ত্ব, ধোঁয়াশা আর মানবজীবনের সেই শ্বাশত সত্য বেঁচে থাকার ক্লান্তিকর চেষ্টা।[৪]

বিশিষ্ট লেখক তপধীর ভট্টাচার্য রিজিয়া রহমান সম্পর্কে বলেন :

> প্রগতি চিন্তা ও বাঙালি জাতিসত্তার স্বচ্ছ দায়বদ্ধ ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান বাংলাদেশের জীবন ও মূল্যবোধের কারুকীর্তি রচনায় অক্লান্ত। *বং থেকে বাংলা* উপন্যাসটি বাঙালি জাতিসত্তার রচনার ধারায় এমন কাহিনি যা ইতিহাসের পটে সামূহিক দর্পণ নির্মাণ করেছে। সেই দর্পণে আত্মজিজ্ঞাসু বাঙালি দেখতে পায় যৌথ অতীত, আবহমান কালে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে নিয়ত নবায়মান যাত্রাকে।[৫]

কবি ও কথাসাহিত্যিক মহীবুল আজিজ রিজিয়া রহমানের *বং থেকে বাংলা* উপন্যাসের মূল্যায়ন করেন এভাবে : 'ইতিহাস-সমাজ-সংসস্কৃতি ইত্যাদির পঠন-পাঠন রিজিয়া রহমানের প্রয়োগ-কৌশলে একটি সামগ্রিকতার অনুভব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।'[৬]

রিজিয়া রহমানের *ডাইম নিকেল* উপন্যাস আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার একটি প্রতিচ্ছবি যেখানে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক পূঁজি অর্থনীতি ও অনুন্নত দেশের মানুষের ওপর তার প্রভাব। অনুন্নত দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের সস্তা শ্রমের জন্য অভিবাসন ঘটে ডলার সাম্রাজ্যে। তেমনি একদল অভিবাসীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি মূলত *ডাইম নিকেল*। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শীলা। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা আসা এবং নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নতুন সংস্কৃতি ও জন্মগত সংস্কৃতির সংঘর্ষে সামান্য শ্রমজীবীতে পরিণত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। ডলারের সাম্রাজ্যে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের রুজিটা বেশি হলেও সাদা চামড়ার সমাজের কাছে তারা নিছক শ্রমিক। ঐ সমাজের বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। ব্যক্তি সম্মানের কোন মান্যতা নেই। সেখানে চলে হায়ার এন্ড ফায়ারের খেলা। সে সমাজের নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিবাহপূর্ব প্রেমিকের সঙ্গে বসবাস, পারিবারিক বন্ধন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক শীলার মতো এশিয়ার নারীরা ভাবতেই পারেনা। সন্তানসম্ভবা হওয়ায় চাকরি ছাড়ার চিন্তা করলে শীলাকে তাই সহকর্মীরা বোকা ভাবে। সেখানে সবকিছু অনিরাপত্তা ও চান্স ফ্যাক্টরে মোড়া। ফলে শীলার স্বামী হাসানকে গোপনে লটারি জয়ের মতো অপেক্ষা করতে হয় চাকরির জন্য। অন্যদিকে শীলা-হাসানের মতো শ্রমজীবীদের সন্তানেরা ভোলে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার; লীন হতে চায় আমেরিকার সংস্কৃতির মধ্যে। অথচ অভীবাসীরা ফিরে যেতে পারে না পুরোনো অবস্থানে। আবার নতুন প্রজন্মের সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়াতেও তাদের আপত্তি। নিউইয়র্কে বসবাসকারী শীলা, হাসান, বুলু আপা, জাহান আরা, রুবী, লিলি, মিসেস আলী, হেলেনের জীবনকে কেন্দ্র করে এভাবে বিশ্বায়িত দুনিয়ায় অভীবাসীদের বিচিত্র দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। আখ্যানের শেষ অংশ চমৎকার। তৃতীয় বিশ্বের তুলনায় ভোগের স্বাদ পেয়ে যাওয়ায় শীলা-হাসান দম্পতি চাকরি ছাড়ার এবং আমেরিকা থেকে ফিরে যাবার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাতিল করে। একটি গভীর আইরনি লুকিয়ে রেখে লেখক কাহিনি শেষ করেন।

*ডাইম নিকেল* একটি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস। বাষট্টি পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের কাহিনি বিন্যস্ত করা হয়েছে সতেরোটি অধ্যায়ে। আমেরিকায় বসবাসকারী একদল বাংলাদেশি নর-নারীর অভিবাসী জীবনই উপন্যাসটির উপজীব্য। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০৭ সালে। *ডাইম নিকেল* উপন্যাসের নির্মাণশৈলী অন্বেষণের পূর্বে উপন্যাসের কাঠামো নিয়ে সমালোচকের উক্তি স্মর্তব্য : '...শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যানভাগ, চরিত্র-চিত্র, পরিবেশ-কল্পনা, বাণীভঙ্গি মিলিয়া সুসম্বন্ধ একটি রূপশিল্প মাত্র।[৭] সমালোচকের উক্তিটি স্মরণে রেখে আলোচ্য উপন্যাসের কাঠামো বিচারের প্রয়াস পাবো।

উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র শীলা বিয়ের এক মাসের মাথায় স্বামীর হাত ধরে চলে আসে আমেরিকায়। আমেরিকা প্রবাসী পাত্র শুনে সুখেই ভেসেছিল শীলা। মা বয়স নিয়ে

আপত্তি করলেও বড়ো ভাই সেটা উড়িয়ে দিয়েছিল পাত্রের বড়ো চাকরি ও পিএইচডি ডিগ্রির কথা বলে। সাত দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়া শীলাকে বান্ধবীরা ঈর্ষা করতে লাগল। শীলার নিজেরও মনোভাব ছিল এমন : 'আমেরিকা নামটা তখন স্বপ্ন জগতের সোনার দরজার চাবি হয়ে চলে এসেছে শীলার হাতে।'[৮]

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে শীলা বাংলায় অনার্স পাস করেছে। বাবা-মা, পারিবারিক বন্ধন, সন্তান, সংসার, বাংলার সবুজশ্যামল মাটির মধ্যে সে বড়ো হয়েছে। বিয়ের পর হঠাৎ করে এই পরিচিত পরিবেশ-সংস্কৃতি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে চলে আসতে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন মুল্লুকে পা রাখার পর শীলার জীবনে বছরজুড়ে চলে নানা ঘাতপ্রতিঘাত। নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোনো সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, ভাষাবিভ্রাট শীলাকে ক্রমশ পাল্টে দিচ্ছিল। শীলা বাধ্য হয় কাজে যেতে, বিদেশি ভাষা রপ্ত করতে। বাঙালি মেয়ের স্বাভাবিক স্বপ্ন ঘরসংসার, সন্তান পালনের ইচ্ছাকে থ্যাঁতলে রোজগারের পথে নামতে হয় শীলাকে। শিখতে হয় নতুন ভাষা।

শীলার স্বামী হাসান। পিএইচডি করার কথা বলে শীলাকে আমেরিকায় নিয়ে আসলেও এখন সে আমেরিকার 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'-এর নিয়মে বেকার। বয়স একটু পড়তির দিকে হলে আমেরিকায় চাকরি আর 'লে-অফ' হাত ধরাধরি করে চলে। সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। কিন্তু হাসান আত্মমর্যাদাবোধের কারণে শীলাকে বলতে পারে না তার বেকারত্বের কথা। ফলে সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে শীলার কাঁধে। শীলাকে নামতে হয় রোজগারের পথে। প্রতিবেশী বুলু আপাই ব্যবস্থা করে দেয় একটি কাজের। আমেরিকায় আসার পরে যে শীলা পিৎজা দাঁতেও কাটেনি, সে শীলার কাজ শুরু হলো পীজার দোকানে। তাকে এখন পেশাগত কণ্ঠে বলতে হয়, 'আওয়ার পীৎসা ইন। মে আই হেল্প ইউ স্যার।'[৯]

এভাবে শীলা আস্তে আস্তে তার খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে সামান্য শ্রমজীবী হিসেবে চিহ্নিত হয়। ইতোমধ্যে শীলা সন্তানের মা হয়। পীজা ইনের কাজের পরিবর্তে অন্য একটি জায়গায় শুরু হয় চাকরি। সেখানকার সহকর্মী জেরী। একদিন নিভৃতে শীলার ওপর চড়াও হয় জেরী। শীলার গালে ঠোঁটের ছোঁয়া লাগিয়ে দেয়। জেরীর কাছে এটি অপরাধ নয়। কাউকে ভালো লাগলে তাকে চুমো খাওয়া সে দেশের কালচার। শীলার অন্য বিদেশি সহকর্মীদের কাছেও বিষয়টি তেমন গুরুতর অপরাধ নয়। কিন্তু ঢাকার মেয়ে শীলা এই অপমান মেনে নিতে পারে না। তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে বিদ্রোহ করে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 'এই সব তুচ্ছ' কারণে কেউ চাকরি ছেড়ে দিতে পারে দেখে সকলেই বিস্মিত হয়। এমনকি শীলার দেশি প্রতিবেশী বুলু আপাও। উপন্যাসে বুলু আপাকে বলতে শোনা যায়, 'বাস্তবকে মেনে নিলে অপমানটা কিন্তু আর অপমান থাকে না। তাছাড়া পৃথিবীর সবকিছু সবসময় কি নির্ভুল নিয়মে চলে?... এসব দুঃখ নিয়ে বসে থাকলে আমাদের দিন চলে না।'[১০]

কিন্তু শীলা অপমানটা ভুলতে পারে না। সবকিছুর জন্য তার হাসানকে দায়ী মনে হয়। হাসানের নির্লিপ্ততা তাকে ভীষণভাবে একাকী করে তোলে। সিদ্ধান্ত নেয় হাসানের মুখোমুখি হবে সে। এ দেশে থাকবে না আর। ফিরে যাবে বাংলাদেশে। কতদিন দেশ দেখে না শীলা। কী হয় মিলিয়ন ডলারের ম্যারাথন রেস ছেড়ে দেশে ফিরে গেলে? উপন্যাসের একেবারে শেষ প্রান্তে দেখা যায়, হাসানের চাকরি আসলে অনেকদিন থেকেই নেই। শীলার কাছে সেটি গোপন করেছে হাসান। তবে গোপনে সে নতুন চাকরির জন্য অপেক্ষা করছিল। 'মার্কিন সমাজে পথের ভিখিরি অথবা ধনীর দুলাল হয়ে পড়া এভাবেই ক্যাসিনোর নিয়মে চলে। সবকিছুই অনিরাপত্তা ও চান্স ফ্যাক্টরে মোড়া।'[১১]

ফলে শীলা চাকরি ছাড়ার পরিকল্পনা বাতিল করে। গালে অন্যের চুম্বনের দাগের কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে কাজে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। এমন সময় নাটকীয়ভাবে হাসানের চাকরির খবর আসে। বছরে পঞ্চাশ হাজার ডলারের আইবিএম-এর চাকরি। উপন্যাসের শেষ দিকে ঘটনার দ্রুততাল লক্ষ করা যায়। হাসানের লোভনীয় চাকরির খবরে শীলা ও হাসানের মন থেকে দেশের ছবি মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। দেশ, ঐতিহ্য ভুলে তারা নিজেদের সফল ও সার্থক ভেবে সুখবরটি উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নেয়। এভাবে রিজিয়া রহমান বিশ্বায়িত দুনিয়ায় অভিবাসী নর-নারীর শেকড় উপড়ানোর গল্পটি বলে যান।

রিজিয়া রহমানের *ডাইম নিকেল* উপন্যাসের কাহিনি অংশের সঙ্গে মিল রয়েছে আমেরিকান লেখক বারবারা এহেরেনরিচ (Barbara Ehrenreich)-এর নিকেল এন্ড ডাইমঃ অন (নট) গেটিং বাই ইন আমেরিকা [Nickel and Dimed: On (Not) Getting by in America] গ্রন্থের। এটি স্মৃতিকথামূলক রচনা। গ্রন্থটিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ ও বিশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুঁজি অর্থনীতি ও তৃতীয় বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হয়ে উঠে অভিবাসী। দেশ গঠনে তারা ভূমিকা রাখলেও চরম বৈষম্যের শিকার হয় তারা। বারবারার বইটিতে রয়েছে অভিবাসী সেসব মানুষের স্বল্প আয়ের মাধ্যমে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের কষ্ট ও সংগ্রাম। রিজিয়া রহমানের *ডাইম নিকেল* (২০০৭) উপন্যাসটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানো একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের শ্রমিকে পরিণত হওয়ার কাহিনি। যেখানে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত শীলাকে কাজ নিতে হয় ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কিংবা পিৎজার দোকানে। অনবরত লে অফ পাওয়া স্বামী সংসারের দায়িত্ব নিতে হয় অড জব করা বুলু আপাকে। সেলস গার্ল এর কাজ করে রুবী। লিলিকে করতে হয় চার চারটে বেবি সিটিং-এর কাজ। জাহান আরার কাজ ব্যাগ তৈরির কারখানায়। উপন্যাসটিতে তাদের অস্তিত্বের সংকটের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংকটকেও তুলে ধরা হয়েছে। আশির দশকে বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে। তাদের মধ্যে বিদেশ গমনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। বিদেশে গিয়ে তারা মুখোমুখি হয় কঠোর জীবনসংগ্রামের। অভীবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম এবং তাদের স্বপ্নভঙ্গের প্রতিচিত্র *ডাইম নিকেল* উপন্যাস।—

> সাহিত্য জীবনেরই একটি অংশ। জীবন প্রতি মুহূর্তেই রূপান্তরমুখী। কালাশ্রিত জীবনের এই রূপান্তরমুখিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই একথা বলা হয় যে, every age is an age of transition। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সম্পর্কের এই সূত্রটি গাণিতিক সূত্রের মতো লেখকের মাথায় ভর না করে থাকলেও উপন্যাসের রচয়িতার কাছে যে-কটি বিষয় আপন মননের সাহায্যে অনুধাবনীয় এই বিষয়টি তার মধ্যে প্রধান। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে আমরা ব্যক্তি ও সভ্যতার সম্পর্কের এই বিশিষ্ট প্রশ্নটিকে বুঝি।[১২]

*ডাইম নিকেল* উপন্যাসটি মাত্র বাষট্টি পৃষ্ঠার এই ছোটো আখ্যানে রিজিয়া রহমান তৃতীয় বিশ্বের ডলারের দুনিয়ায় শ্রমজীবী মানুষ, তাদের অভিবাসী জীবন, সে সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তাদের সাংস্কৃতিক সংকট, ভাষাবিভ্রাট, ক্রমাগত তাদের পরিচয়চিহ্ন খুইয়ে যাওয়া প্রভৃতির দক্ষ উপস্থাপন করেছেন। রিজিয়া রহমানের কথাসাহিত্য আখ্যানবৈচিত্র্যে অনন্য। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে তিনি তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন। তাঁর দীর্ঘ লেখকজীবনে আখ্যানের তেমন পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। এ উপন্যাসে তিনি অভিবাসী জীবনকে উপজীব্য করেছেন। এই আখ্যানের বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনুভূতিহীন নিষ্প্রাণ বর্ণনা কেবল নয় এই আখ্যান বরং অসামান্য দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি আখ্যান বয়ানে সচ্ছল গতি দিয়েছেন। আখ্যানের শুরুতে পাঠকের মনে যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের আলোকে তিনি উপন্যাসের আখ্যানবৃত্তটি তৈরি করেন। উপন্যাসের শুরুটা এমন :

> অন্যদিনের চেয়ে একটু দেরি হল সাবওয়ে স্টেশন থেকে বের হতে। ভূগর্ভ ছাড়িয়ে ছায়া নামা ধূসর ফুটপাতে পা রাখতেই বিশাল শূন্যতা খাঁ খাঁ করে উঠল। অথচ সবই তো ঠিক একই রকম আছে। রোজ যেমন থাকে। পার্কের কোণে তাইওয়ানীজ বুড়ো হটডগের গাড়ি নিয়ে ভ্যান্ডারগিরি করছে। টহলদারী পুলিশ আড্ডায় মগ্ন পথচারী দুজন মহিলা পুলিশের সঙ্গে। বাস স্টপেজে কাজ ফিরতি বিবর্ণ মানুষের লম্বা লাইন। সাদা ওকগাছের পাতা ঝরে পড়ছে পার্কের ঘাসে। বৈকালিক নিউইয়র্কের নৈমিত্তিক ট্রাফিক জ্যাম রাস্তায়। দেওয়ালে ঝুলানো পুরোনো ক্যালেন্ডারের মতই বিকেলটায় অতি পরিচিত একঘেয়েমি।[১৩]

উপর্যুক্ত বর্ণনায় অভিবাসীদের ক্লান্ত, বিপর্যস্ত জীবনের বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য জীবনযাত্রার একটি ছবি এঁকেছেন লেখক।

সতেরোটি অধ্যায় নিয়ে উপন্যাসটি বিন্যস্ত। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে লেখক উপন্যাসে একেবারেই সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে আটকে থাকেননি বরং চরিত্রের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ সমান্তরালে চলেছে। প্রধান চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রের অন্তর্জগতের বাস্তবতাকে তিনি তুলে এনেছেন। উপন্যাসের কাহিনি ও প্লটসংঘটন একমুখী। কাহিনি মূলত শীলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে অন্যদের প্রতিও নজর দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য চরিত্রগুলোও ভূমিকা রেখেছে।

*ডাইম নিকেল* উপন্যাসটির নামকরণ খুবই অর্থবহ। নামটি সংকেতধর্মী। নামকরণ নানারকম হতে পারে। চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ, ঘটনাকেন্দ্রিক নামকরণ, লেখকের প্রতীতি অনুসারে, লুকানো কোনো অর্থ বা বিশেষ কোনো স্থানের নামানুসারে নামকরণ হতে পারে। *ডাইম নিকেল* নামটি প্রতীকী অর্থ বহন করে। 'ডাইম' কথাটি দ্বারা মার্কিন মুদ্রায় 'দশ সেন্ট' পরিমাণ বোঝায়; আর 'নিকেল' হলো পাঁচ সেন্টের সমান। এর অন্য একটি অর্থও রয়েছে, তা হলো তুচ্ছ বা অসার।

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা (বাঙালি অভিবাসী) সবাই আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সেখানে তাদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তার সঙ্গে তুলনা করে লেখক এরকম নামকরণ করেছেন। এক্ষেত্রে সমালোচকের উক্তি স্মরণযোগ্য :

> আমাদের সমাজে খুচরা বলতে টাকা-আধুলি-সিকি। লক্ষ-কোটির তুলনায় ওগুলো যা, ডলার সাম্রাজ্যের বিলিয়ন-মিলিয়নের তুলনায় ডাইম-নিকেলও তাই। আজও এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে আমেরিকা-ইংল্যান্ড পাড়ি দিলে প্রতিবেশীর চোখে গৌরবের ও সাফল্যের মানদণ্ডের পাশাপাশি নিজের মধ্যে ভেসে ওঠে হীনম্মন্যতার বুদ্বুদ। তাদের সম্পর্কে কাল্পনিক স্বর্গ বা বেহেস্ত এর স্বপ্ন বুনতে থাকে। রঙিন কল্পনার বেলুনটিকে রিজিয়া রহমান অদ্ভুত সার্থকতায় ফুটো করে দিয়েছেন ডাইম নিকেল ছোট আখ্যানটিতে। তথাকথিত বেহেস্ত তৃতীয় বিশ্বের যারা অভিবাসী–আসলে ডলারের পাশে নিছক ডাইম নিকেল।'[১৪]

উপন্যাসটি আয়তনে ছোটো। স্বাভাবিকভাবে এখানে চরিত্রসংখ্যা কম। 'আসলে যথার্থ উপন্যাসে আমরা চরিত্রকেই চাই। ঘটনাসমূহ প্লটের আকারে বিচ্ছিন্ন নিঃসম্পর্কিত চরিত্রগুলিকে সম্পর্কায়িত করে এবং শুধু চরিত্রই নয়, বাইরের বাস্তুজগতের সঙ্গে তাদের অন্তর্লোকের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিকাশ ও পরিণামের দিকে নিয়ে যাওয়াই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য।'[১৫] প্রধান চরিত্র হাসান ও শীলা। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে বুলু আপা, রেণু, লিলি, আনোয়ারা, জাহান আরা, নিলুফা, হাফিজ সাহেব, আবিদ সাহেব, হক সাহেব প্রমুখ। এরা সবাই অভিবাসী বাঙালি। বিদেশি চরিত্রের মধ্যে রয়েছে ডনা, জেরী, স্যারা, দানা, ক্রিস্টিন, নায়ার প্রমুখ। এই চরিত্রগুলো নিয়ে উপন্যাসের সামগ্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। শীলা-হাসানের কাহিনিটি প্রধান হলেও প্রতিবেশী বাঙালি বুলু আপার কাহিনিও সমান্তরালে উপন্যাসটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। চরিত্রগুলোর সমৃদ্ধ দিক হলো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। লেখক চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন দেখিয়েছেন। ফলে চরিত্রগুলো বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করেছে। ঘটনাপ্রবাহ যেহেতু শীলা আর বুলু আপাকে কেন্দ্র করে, তাই জটিল প্রশ্নগুলো তাদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে রিজিয়া রহমান তাদের কথাবার্তা, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়াকর্ম ও অপরাপর চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কায়িত করে এঁকেছেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলো উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সবাই উচ্চশিক্ষিত। হাসান পিএইচডি করার জন্য আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে। হাফিজ সাহেব দন্ত চিকিৎসক। দেশে জমজমাট ক্লিনিকের ব্যবসা ছেড়ে চলে আসেন আমেরিকায়। আবেদ সাহেব ইঞ্জিনিয়ার। সবাই উচ্চশিক্ষিত। ফলে তাদের ভাষা ও সংলাপে রয়েছে তার প্রভাব। অর্থাৎ লেখক চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ তৈরিতে যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ছিল তা লেখক ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। আমেরিকায় বাঙালি অভিবাসী সমাজ ও জীবন, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক সংকট, অভিবাসী জীবনের কর্মপরিবেশে যে ধরনের ভাষা ও সংলাপের ব্যবহার প্রত্যাশিত, তেমন ভাষাই তিনি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসে লেখক উপজীব্য বিষয় ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। বিষয় ও চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারের উদাহরণ দেয়া হলো :

১ চাকরিটা ছাড়বার প্রস্তুতি নিয়েই দোকানে এল শীলা। উইকএন্ডের দুরাত্রির জমজমাট ভিড়ের পর সোমবার সকালটা একেবারেই ফাঁকা। গতকাল ক্লোজিংয়ে ছিল উইলমা। প্রচণ্ড ফাঁকি দিয়েছে। একগাদা কাজ জমিয়ে রেখে গেছে শীলা আর ডনার জন্য। রবার্তো আর উইলমা এসে পৌছায়নি। কীচেনের কাজ গুছিয়ে ডনার পাশে এসে দাঁড়াল শীলা–ডনা, এই উইকের পর থেকে আমি আর কাজে আসছি না। [পৃ. ১৮]

২ দোকানে আজ শনিবারের লাঞ্চ স্পেশ্যাল দেয়া হচ্ছে। 'বাই টু এক্সট্রা লারজ, গেট ওয়ান ফ্রী'র আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছে। তিনটে অ্যাভেনে পীজা তৈরি করে কুলোতে পারছে না রবার্তো আর তার ব্ল্যাক অ্যাসিস্ট্যান্ট উইলমা। স্টকের ডো শেষ। ডো তৈরি করার কাজটা শীলার। ফোনের অর্ডারও শীলাই নেয়। এখানকার সবাই জানে শীলাকে পছন্দ করে টোবি। একসঙ্গে অনেক কাজ বাতাসের গতিতে করতে পারে শীলা। একটু আগেই চারটে লারজ সাইজের ক্যালাজেন, দুটো জায়রো চটপট বানিয়ে দিয়েছে শীলা। [পৃ. ১৬]

'শব্দের যে আভিধানিক অর্থে আমরা অভ্যস্ত, সহসা যখন সে অর্থের পাশ কাটিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো শব্দটি অপ্রত্যাশিত দ্যুতিলাভ করে তখন পাঠকচিত্তে যে-বিস্ময়ের সঞ্চার হয় সে–বিস্ময় শিল্পসুখের অঙ্গ।'[১৬] এই সমালোচক উক্তির সমর্থন রয়েছে রিজিয়া রহমানের ভাষায়। শব্দের বিস্ময়কর দ্যুতি, আচমকা নতুন ইঙ্গিত, নতুন দ্যোতনা রিজিয়া রহমানের ভাষাকে শিল্পরসসমৃদ্ধ করেছে। রিজিয়া রহমানের কথাসাহিত্যে উপমা প্রয়োগ এবং নতুন নতুন উপমা সৃষ্টি তাঁর শিল্পসত্তার মৌল প্রবণতা। তাঁর উপমা-উৎপ্রেক্ষার উৎস বাস্তব অভিজ্ঞতা। উপমা প্রয়োগে ভাষা লক্ষ্যভেদী হয়। পাঠকের মনে উদ্দিষ্ট অভিঘাত সৃষ্টি করে। রিজিয়া রহমানের কথাসাহিত্যে সুযোগ হলেই তিনি উপমা ব্যবহার করেন। এ উপন্যাসেও উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার ভাষাকে চমৎকৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ :

ভূগর্ভ ছাড়িয়ে ছায়া নামা ধূসর ফুটপাতে পা রাখতেই বিশাল শূন্যতা খাঁ খাঁ করে উঠল। [পৃ. ৭]

দেয়ালে ঝুলানো পুরোনো ক্যালেন্ডারের মতই বিকেলটায় অতি পরিচিত একঘেয়েমি। [পৃ. ৭]

অন্যদিন উঁচু হিলের শব্দে ব্যস্ততা ছিটিয়ে দ্রুত হাঁটে শীলা। [পৃ. ৭]

তখন ক্লান্ত নরম বিকেলটি ধারালো ছুরি হয়ে বিঁধে গেল বুকে। [পৃ. ৭]

হাসিটা ছড়িয়ে গেল কাচের মত স্বচ্ছ নীল চোখের তারায়। [পৃ. ৭]

করিডোরে ধোঁয়াটে অন্ধকার হামাগুড়ি দিচ্ছে। [পৃ. ২৯]

এক বেডরুমের নিশব্দ নির্জনতা নরম হাত বুলিয়ে দিল মুখে। [পৃ. ২৯]

আমেরিকা নামটা তখন স্বপ্ন জগতের সোনার দরজার চাবি হয়ে চলে এসেছে শীলার হাতে। [পৃ. ৩১]

মাথা ঝাঁকিয়ে নায়ারের দিকে তাকাল চুম্বক-আকর্ষণী দেহের সুন্দরী স্যারা। [পৃ. ৪১]

... নাইলনের টাইটস অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরেছে শরীর। [পৃ. ৩৭]

> বুলু আপার গলার শব্দ জীয়ন কাঠি হয়ে ছুঁয়ে দিল শীলাকে। [পৃ. ৪৪]
>
> দেশ, কথাটার উচ্চারণ লক করে রাখা আবেগের দরোজা খুলে দিল।
>
> লম্বা পাতলা একহারা গড়নের বুলু আপার চেহারায় লালিত্য ফেরারী হয়েছে অনেক আগেই। [পৃ. ৫০]

উপন্যাসের কলাকৌশল এর বিষয়ের কেবল বাইরের দিক নয়, এটি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ রূপকল্পের সহায়ক। আর তাই উপন্যাসের বিষয় ও কলাকৌশলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।—

> যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোলালিত মানব-অস্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাতময় রূপ একজন ঔপন্যাসিকের আরাধ্য, সেই সংঘাতময় জীবনকে অনিবার্য রূপাঙ্গিকে প্রকাশ করাও তার স্বধর্ম। যুগচৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রক্তক্ষরণ ও বেদনার ইতিহাসকে অনিবার্য শৈলীতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব শিল্পীর স্বকীয়।[১৭]

সাহিত্যের প্রকাশ রূপ ও রসভিত্তিক। সাহিত্যিককে সৃষ্টির শুরুতে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। কেননা দুয়ের সম্মিলনে শিল্প সৃষ্টি হয়। রূপ হলো সাহিত্যের Form বা আঙ্গিক আর রস হলো সাহিত্যের আরাধ্য বা বিষয়। 'রস ও রূপের সমবায়ী সম্পর্ক শিল্পসৃষ্টির বা বড় অর্থে সৃজনশীলতার পরিচায়ক। রূপ রসের বাহন, রস রূপের প্রাণ; একটি ছাড়া অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না।'[১৮]

তবে উপন্যাসে রিজিয়া রহমান পুরোনো ছক বা গতানুগতিক ফর্ম মানেননি। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের মতো *ডাইম নিকেল* উপন্যাসেও পুরোনো ছক তিনি ভেঙেছেন। উপন্যাসের কোনো কোনো জায়গায় তিনি চেতনাপ্রবাহরীতি অবলম্বন করেছেন। তথাপি উপন্যাসের কাহিনি ও প্লট সংগঠন একমুখী থেকেছে। কাহিনির একাগ্রতা নষ্ট হয়নি। নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় রিজিয়া রহমান বিষয়নিষ্ঠ থাকার পাশাপাশি কর্তব্যবোধ ও উদ্দেশ্যবাদিতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। আর তাই নামকরণে প্রতীক-সংকেত ও কাব্যগন্ধী শব্দবন্ধের আশ্রয় নিয়েছেন। *ডাইম নিকেল* উপন্যাসের নামকরণটিও প্রতীকী যা গভীর অর্থদ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত। উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রধান লক্ষ্য শব্দের নিজস্ব সত্তার বাইরের নতুন অর্থের প্রসারণ। আলোচ্য উপন্যাসের উপমা প্রয়োগকৌশল উপন্যাসের বক্তব্যকে ক্ষিপ্র ও লক্ষ্যভেদী করেছে। রিজিয়া রহমান অকারণে উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার না করে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করেছেন।

কাহিনির বিস্তার ও চরিত্রের বিকাশ স্পষ্ট হয় ভাষার মাধ্যমে। রিজিয়া রহমানের বিশেষত্ব হলো বিষয় ও বর্ণনার প্রয়োজনে তিনি শব্দ নিয়ে খেলতে পারেন। আর তা করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁর ভাষা কাব্যিক বা গীতিধর্মী হয়ে পড়ে। তবে রিজিয়া রহমানের সে কাব্যধর্মিতা কল্পনার জালে আবদ্ধ নয় বরং বিষয়কে স্পষ্ট করাই তাঁর লক্ষ্য। আলোচ্য প্রবন্ধেও লেখক আমেরিকায় বাঙালি অভিবাসী সমাজ ও জীবন, তাদের সাংস্কৃতিক সংকট ও অভিবাসী জীবনের কর্মপরিবেশে যে ধরনের ভাষা ও সংলাপ প্রত্যাশিত, সে ধরনের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। রিজিয়া রহমানের পর্যবেক্ষণক্ষমতা অত্যন্ত গভীর বলে ডিটেইল বা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। অন্যান্য উপন্যাসের মতো *ডাইম নিকেল* উপন্যাসেও পরিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে সেটি লক্ষ করা যায়।

রিজিয়া রহমানের উপন্যাসের পরিচর্যারীতি অধিকাংশ সময় বিবরণধর্মী। ক্ষেত্রবিশেষে তা ঘটনাধর্মী। আবার কখনও কখনও তা তথ্যধর্মী। তাঁর কথাসাহিত্যের গল্পবিষয়ে বহির্বাস্তবতাকে তিনি প্রাধান্য দিলেও ক্ষেত্রবিশেষে গল্পবস্তুকে তিনি অন্তর্মুখী ও ইঙ্গিতময় করে তোলেন। উপন্যাসের অভিপ্রায় বা পরিণামী বাস্তবতাকে দ্যোতিত করার জন্য কখনো কখনো তিনি প্রতীকতার আশ্রয় নেন। ভাষা এক্ষেত্রে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ভাষা কথাসাহিত্যের শৈলীবিচারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিষয় বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি ও পরিচর্যাকে স্পষ্ট করে তোলে ভাষা। রিজিয়া রহমানের কথাসাহিত্যের ভাষা একটি নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ধারণ করে। তাঁর ভাষা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও অলংকারবহুল। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকসময় আভিধানিক অর্থকে ছাপিয়ে আলংকারিক ভাষায় রূপান্তরিত হয় যার মধ্যে দিয়ে পাঠক হৃদয়ে কল্পনার বিস্তার ঘটে। তাঁর ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য হলো বাক্য সরল ও চাতুর্যপূর্ণ। বিষয় ও বর্ণনার প্রয়োজনে তিনি শব্দ নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলেন। উপন্যাসে অনেকক্ষেত্রে তিনি কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই কাব্যধর্মী ভাষা উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি অলংকার আশ্রয়ী। ফলে উপন্যাসের ভাষার শরীর উপমা, উৎপ্রেক্ষা আর চিত্রকল্পের রঙে রঙিন। সে রঙ কাল্পনিক নয় বরং বিষয়কে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে সে-ভাষা ব্যবহার করেছেন রিজিয়া রহমান।

রিজিয়া রহমান বিচিত্রপ্রজ কথাসাহিত্যিক। ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে শুরু করে সমাজজীবনের সকল দিক তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। এমনকি বিদেশি সংস্কৃতি, ইউরোপীয় জীবনযাত্রার প্রতি বাঙালির আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। আলোচ্য উপন্যাসে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুধাবিভক্ত সমাজ, তৃতীয় বিশ্ব থেকে পাড়ি জমানো শ্রমজীবী মানুষ, তাদের গড়ে ওঠা নতুন সমাজ, শেকড় উপড়ানো সমাজটির উত্তরপ্রজন্মের সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুতিসহ বিচিত্র দ্বন্দ্বকে চমৎকার নির্মাণকৌশলের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

**তথ্যনির্দেশঃ**

১ বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা, আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ১০৩
২ চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), *গল্পকথা*, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৮, রাজশাহী, ২০১৭, পৃ. ২৭০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৭ শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, ঢাকা, সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ১০৩
৮ রিজিয়া রহমান, *ডাইম নিকেল*, ঢাকা, সাহিত্য বিলাস, ২০০৬, পৃ. ৩১
৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১১ চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), *গল্পকথা*, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৮, রাজশাহী, ২০১৭, পৃ. ২৭৪
১২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭১, পৃ. ৩২
১৩ রিজিয়া রহমান, *ডাইম নিকেল*, ঢাকা, সাহিত্য বিলাস, ২০০৬, পৃ. ৭

১৪ চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), *গল্পকথা*, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৮, রাজশাহী, ২০১৭, পৃ. ২৭০
১৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমালোচনার কথা*, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০০১, পৃ. ২৭১
১৬ অমলেন্দু বসু, *সাহিত্য চিন্তা*, কলকাতা, সাহিত্য পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৯, পৃ. ৬৯
১৭ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ৮১
১৮ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৬১